একবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা
১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

একবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা

১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

BPATC LIBRARY
JOURNAL SECTION
SAVAR, DHAKA

সম্পাদক: ড. রোকেয়া ফাহমিদা, পরিচালক
সহকারী সম্পাদক : মীর মো: তৌফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
www.bpatc.org.bd

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, একবিংশতিতম বর্ষ সংখ্যা ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২০২১-২০২২ খ্রিস্টাব্দ
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 21th Year Issue 1429/2021-2022

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

©বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪৩০/এপ্রিল ২০২৩

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০

টেলিফোন : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ২০৮০-৮৫, ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০১০-১৬

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-২২ ৪৪৪ ৫০২৯

ওয়েব সাইট : www.bpatc.org.bd

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

উপ-পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মীয় চেতনা: বিশ্বাস ও অনুশীলনে ০১
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ এবং মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিতা নারীদের পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রণীত রাষ্ট্রীয় নীতি: বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। ১৭
রাকিবা সুলতানা রত্না

মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ অধিকার ও বাংলাদেশ: একটি নৈতিক প্রেক্ষাপট ৩৯
ড. আকিকুল হক

প্লাস্টিক আগ্রাসন ও মুলাদী উপজেলার মৃৎশিল্প ৫১
বি. এম. শহীদুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার প্রশাসনিক বিবর্তণ ও ক্রমবিকাশ ঃ একটি বিশ্লেষণ ৭৭
মারুফা আক্তার

BRAC LIBRARY JOURNAL SECTION DHAKA

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মীয় চেতনা: বিশ্বাস ও অনুশীলনে

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ* এবং মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ**

Abstract

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, one of the most discussed personalities of the twentieth century, was born in a respectable Muslim family at Tungipara in Faridpur district when the anti-British movement of the Indian sub-continent was in the brewing. Facing different obstacles and hardships, he led several movements including Pakistan establishment movement, the Language Movement and those for establishing the rights of common, suppressed people of the then East Pakistan. Bangladesh as a sovereign, independent state emerged under his strong and dynamic leadership. He included 'secularism' and 'socialism' in the fundamental principles of the constitution. This particular act invited criticism from some people who doubted the existence of Islamic norms and values in him. Quite naturally, it is needed to investigate into the religious beliefs this great figure possessed and practiced. Evidence shows that Bangabandhu possessed religious thoughts and practiced them from his early childhood. His family atmosphere shaped his beliefs in Islam. He has immense contribution in spreading Islam in the newly independent Bangladesh. He launched multi-dimensional programs to promote and spread Islam in this country.

ভূমিকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, ইতিহাসের মহা নায়ক বাংলাদেশের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, প্রথম রাষ্ট্রপতি ও ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। সমাজ, দেশ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বাঙালি জাতির অধিকার রক্ষায় তিনি নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এক সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় ঐতিহ্যের ধারক বাগদাদের দরবেশ বংশের সন্তান। শৈশবকাল থেকেই ইসলামী ভাবধারা ও ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে ধর্মে বিশ্বাস ও অনুশীলনে তিনি ধর্ম চর্চার উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁর বক্তৃতা ও ভাষণে ইসলামী ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি সর্বদা, ইসলাম ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি ও আত্ম সংযম নিয়ে কথা বলতেন। ভাষা ও দেশকে ভালোবাসার কথা

* সহকারী অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। Mail: hadayet18ibs@gmail.com, Cell: 01711043639

** সহকারী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। Mail: rahmatullah.rajon1976@gmail.com, Cell: 01552328955

বলতেন। তিনি ইসলামের উপর পূর্ণ আস্থাশীল ও নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি ইসলামকে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন। পাশাপাশি মানবীয় গুনাবলীতেও শৈশব থেকে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। কৈশোর জীবনে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেন স্কুল পরিদর্শনে আসা শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক কে সম্বর্ধনা দেয়ার মাধ্যমে।[১] রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণ করেন মিশন স্কুলে অধ্যয়নকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট থেকে।[২] ১৯৩৯ সালে প্রথম কারাবরণ করেন।[৩] ১৯৪০ সালে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন।[৪] ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৮-এর সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচনসহ অধিকাংশ আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি এ জাতির নেতৃত্ব দেন। বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে আজীবন সংগ্রাম করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে পুনর্গঠনের জন্য সময় পান মাত্র সাড়ে তিন বছর। তিনি তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ গঠনে অবদান রাখেন। ব্যক্তি জীবনে পারিবারিকভাবে তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে বড় হন। ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী তিনি বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইসলামের খেদমতে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ সকল উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তার ধর্মীয় চেতনা ও ভাবধারার প্রকাশ পায়। বক্ষমান নিবন্ধে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মীয় চেতনা: বিশ্বাস ও অনুশীলনে' আলোচিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মীয় চেতনা: বিশ্বাস ও অনুশীলনে' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে প্রধানত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মূদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ও পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া বা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সবিস্তর জানা। উৎসগত শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী প্রবন্ধটিতে যে সকল তথ্য উপাত্ত তা মুলত দুই ধরণের। এর একটি হচ্ছে প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত; যা বঙ্গবন্ধুর জীবনে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার দলিল, প্রামাণ্য বস্তু সামগ্রী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা এবং অডিও ভিডিও প্রাথমিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহায়ক উপকরণ; যা প্রবন্ধটিতে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, গবেষণাকর্ম, জার্নাল, পুস্তক আকারে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, সাময়িকী, বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি। একটি দেশের নাগরিক হিসেবে সেই দেশের স্থপতির দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস এর ব্যাপার তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ এ মুসলিম দেশে জাতির জনকের জীবনে ধর্মীয় চেতনা কেমন ছিল সেই ইতিহাস জানা খুবই জরুরী। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মীয় চেতনা: বিশ্বাস ও অনুশীলনে' শীর্ষক প্রবন্ধটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ধর্মভাবনা, ধর্ম চর্চা এবং ধর্মের বিকাশে তার নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। যে

[১] মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ১৪।

[২] তদেব, পৃ. ১৫।

[৩] তদেব, পৃ. ১৫।

[৪] ১৯৪০ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন ও বাংলা মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাছাড়া তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারীও নির্বাচিত হন। মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, (বাংলা একাডেমি: মার্চ ১৯৭৪), পৃ. ১৫।

LIBRARY

সকল কর্মসূচী গ্রহণ স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মীয় চেতনা বিকাশের জন্য নিয়ামক শক্তি হিসেবে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে সে সকল সিদ্ধান্তসমুহের স্বরূপ জানা ও জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ ঢাকা শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সায়রা খাতুন। তিনি ছিলেন শেখ লুৎফুর রহমানের চাচাত বোন ও বড় চাচা শেখ আব্দুল মজীদের মেয়ে। তারা ছিলেন আদর্শবান ও ধার্মিক।[৫] তাঁর পিতা ছিলেন সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার।[৬] বঙ্গবন্ধুর জন্মের পর নানা শেখ আব্দুল মজিদ আলকুরআনুল কারীমের সূরা হূদ এর একটি আয়াত থেকে বাছাই করেতাঁর নাম রাখেন মুজিবুর রহমান। যার অর্থ রহমানের ডাকে সাড়াদানকারী, উত্তরদানকারী। নাতির রাখার সময় নানা বলেন, 'মা সায়েরা তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম, যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।'[৭] তার পূর্বপুরুষ ছিলেন দরবেশ শেখ আউয়াল।[৮] তিনি 'শেখ বুরহান উদ্দিন' একজন বিখ্যাত আলেম হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর থেকে এ 'শেখ' বংশের সূচনা হয়।[৯] 'শেখ' শব্দটি এসেছে আরবী থেকে। যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে খুবই শক্তিশালী, বিপুল ক্ষমতাধর বা আভিজাত্যসম্পন্ন।[১০] ল্যাটিন শব্দ 'সেনেভ' এর বাংলা 'বয়োবৃদ্ধ বা সম্মানিত' এর আরবী প্রতিশব্দ হলো 'শেখ'। সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতাবান শাসকদের পদবী হিসেবেও 'শেখ' এর ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। মহামতি শেখ আউয়াল নামে এক দরবেশের ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গীয় এলাকায় আগমন করেন।[১১] ইরাক থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিশ্ববিখ্যাত ওলীয়ে কামেল ও সুলতানুল আরেফিন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) এর সফরসঙ্গী হয়ে ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে বঙ্গে আগমন করেন। আল্লাহর এ মহান ওলী সমুদ্রপথে জাহাজে করে আসেন বারো আউলিয়ার পূণ্যভূমি খ্যাত চট্টগ্রামে এবং এখানেই আস্তানা গড়েন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে। দরবেশ শেখ আউয়াল ছিলেন হযরত বায়েজিদ (র) এর ঘনিষ্ঠদের অন্যতম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ আব্দুল আউয়াল দরবেশেরই সপ্তম অধঃস্তন বংশধর ছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেন, 'আমার জন্ম হয় এই টুঙ্গিপাড়া শেখ বংশে। শেখ বুরহান উদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে।'[১২] শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় ১৯২৭ সালে ডিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তিনি ১৪ বছর বয়সে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে হার্ট দূর্বল হয়ে পড়ে এবং গ্লুকুমা

[৫] ভবেষ রায়, বঙ্গবন্ধুর জীবন কথা, (ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬), পৃ. ১৭।

[৬] মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ১৩।

[৭] শেখ হাসিনা, শেখ মুজিব আমার পিতা, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, একত্রিশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ১৬; রফিকুজ্জামান হুমায়ন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম (ঢাকা: জনতা প্রকাশ, ২০১৪), পৃ. ১৫।

[৮] শেখ মুজিবুর রহমান, পিতা শেখ লুৎফর রহমান, পিতা শেখ আব্দুল হামিদ, পিতা শেখ তাজ মাহমুদ, পিতা শেখ মাহমুদ ওরফে তেকড়ী শেখ, পিতা শেখ জহির উদ্দিন, পিতা দরবেশ শেখ আউয়াল তিনি হযরত বায়জীদ বোস্তামী (র) এর সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রি. বঙ্গে আগমন করেন। অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৮), পৃ. ৫।

[৯] মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর ভাষণে ইসলামী ভাবধারা, (ঢাকা: বিআইটি পাবলিকেশন্স, ২০২১), পৃ. ১৭।

[১০] শেখ সাদী, বঙ্গবন্ধু অভিধান, (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০২০), পৃ. ৯।

[১১] দরবেশ শেখ আব্দুল আউয়াল ওরফে শেখ বুরহানুদ্দীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র) সঙ্গে ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় এলাকায় আগমন করেন। অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও ড. মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু, পৃ. ১৭।

[১২] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ৩।

রোগে আক্রান্ত হন। তিন বছর স্কুলে না গিয়ে ১৭ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়ণরত চাচাত বোন শেখ ফজিলাতুন্নেছা রেনুর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।[১৩] স্কুলে অধ্যয়নকালে ছাত্রাবস্থায়ই শেখ মুজিব দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে 'মুসলিম সেবক সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেছিলেন। দলীয় কর্মীদের নিয়ে তিনি মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করতেন এবং এই অর্থ দিয়ে দরিদ্র ছেলেদের জ্ঞান লাভের পথ সুগম করে তুলতেন। নিজের কাঁধে মুষ্টির চাল বহন করে বাড়িতে বাড়িতে যেতেন এবং সংগৃহীত মুষ্টির চাল গরিব-দুঃখিদের মধ্যে দান করতেন; অথবা গ্রামের স্কুলের উন্নতি সাধনের জন্য এইভাবে মুষ্টিভিক্ষা করতেন। মানুষের দুঃখ তাকে সর্বদাই অস্থির করে তুলত।[১৪] তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেন, "যদি কোন মুসলমান চাউল না দিত আমার দলবল নিয়ে তার উপর জোর করতাম। দরকার হলে তার বাড়িতে রাতে ইট মারা হত। এজন্য আমার আব্বার কাছে অনেক সময় শাস্তি পেতে হত। আমার আব্বা আমাকে বাধা দিতেন না।"[১৫] কিশোর বয়স থেকে অসহায়কে সাহায্য করার যে গভীর অনুভূতি তৈরী হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর তা আমাদের মহানবীর 'হিলফুল ফযুল' গঠনের সাথে তুলনা করা যায়।[১৬] কারণ রাসূলও (সা.) তার নবুয়্যাত লাভের পূর্বে মানবতার কল্যাণে কাজ করেছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনায়। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইন্টার মিডিয়েটে কলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৪ সালে 'ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাসোসিয়েশন' এর সেক্রেটারী ছিলেন।[১৭] ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনী কাজ চালানোর পুরো দায়িত্ব পালন করেন।[১৮] এ বছরেই তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলার খাদ্য-ঘাটতির ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সাথে তিনিও প্রতিবাদ আন্দোলনে 'ভুখা মিছিলে'র নেতৃত্ব দেন। সরকার ক্ষেপে গিয়ে উভয় নেতাকে কারারুদ্ধ করেন।[১৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণির কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। তমদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সূচিত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চলাকালে কারারুদ্ধ অবস্থায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেন এবং শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ২৭শে ফেব্রুয়ারি মুক্ত হন। এর কিছুদিন পরেই প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে এক সভায় মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ সভাপতি এবং

[১৩] "শেখ মুজিবের অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর বিয়ের সময় সম্পর্কে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্ত বঙ্গবন্ধু এক সাক্ষাৎকারে আমাকে জানিয়েছেন যে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিয়ে করেন।" মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ২৩।

[১৪] এ্যাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১১), পৃ. ৮৪৬।

[১৫] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ৯-১০।

[১৬] 'হিলফুল ফুযুল' আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ শান্তিসংঘ। রাসূল নবুয়্যাত লাভের পূর্বে তরুণ বয়সে এ শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

[১৭] কলকাতায় ফরিদপুরবাসীদের একটি সংস্থা। প্রেসিডেন্ট ছিলেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান।

[১৮] শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে এ দায়িত্ব দেন। মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ৫৯।

[১৯] মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ১১৯।

তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেয়া হয় এবং সেখানে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা পালন করে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সেনাবাহিনীর একদল অফিসারের অভ্যুত্থানে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ তিনি নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন।[২০] হাজারের বছরের বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কালজয়ী এক নেতার বিয়োগে পুরো জাতির ভাগ্যাকাশে অন্ধকার নেমে আসে।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চেতনা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব থেকেই ইসলামী নীতি ও আদর্শের চেতনায় লালিত পলিত হন। যৌবনে সেই আদর্শে তীব্র বিশ্বাস এবং মানবিক সেই মূল্যবোধ তিনি ধারণ করেই দেশ, জাতি ও মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে তিনি কখনও পিছপা হননি।[২১] তিনি ব্যক্তি জীবনে ইসলাম চর্চা ও ইসলামী অনুশাসনের প্রতি গভীর বিশ্বাস লালন ও প্রতিপালন করতেন। ইসলামের খেদমতে তাঁর নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রমাণ করে তিনি ইসলামী চেতনার অনুশীলন করতেন।

পারিবারিক পরিবেশে ধর্মীয় শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিবেশে পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়েরা বেগমের তত্ত্বাবধানে। তাঁর মা ছিলেন খুব ধর্মভীরু। তিনি প্রথম ছেলে সন্তান হওয়ার কারণে মা তাঁকে খুব আদর করতেন। তিনি নিজেও মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। মা তাঁর ছেলে-মেয়েদের জীবনের শুরুতেই ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন।[২২] তিনি আদরের পুত্র খোকার (বঙ্গবন্ধুর পারিবারিক নাম) জন্য বাড়ীতে তিনজন শিক্ষক রেখেছিলেন। একজন ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য মৌলভি সাহেব, দ্বিতীয়জন সাধারণ শিক্ষার জন্য পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহ পাটোয়ারী, তৃতীয়জন কাজী আবদুল হামিদ। বঙ্গবন্ধু মৌলভি সাহেবের কাছে আমপারা আর পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাাহর কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা পড়তেন এবং কাজী আবদুল হামিদের কাছে পড়তেন কবিতা-গল্প ইত্যাদি।[২৩] অর্থাৎ বাল্যকালে ধর্মীয় শিক্ষা তিনি পারিবারিকভাবেই পান।

ইসলামী অনুশাসন পালনে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু সরাসরি ঐশি বাণী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অর্থসহ পাঠ করতেন এবং ধর্মের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতেন। ধর্মের ঐশি বাণী থেকেই সঠিকভাবে ধর্ম জানা যায়। তিনি তার আত্মজীবনীতে বলেন,

[২০] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম সং., ২০১৪ খ্রি.); রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম (ঢাকা : জনতা প্রকাশ, দ্বিতীয় সং., ২০১৪ খ্রি.); মোনায়েম সরকার ও অন্যান্য সম্পাদিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি (বাংলা একাডেমি : ফেব্রুয়ারি ২০০৮); ইশতিয়াক আলম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০০৬)।

[২১] শেখ হাসিনা, শেখ মুজিব আমার পিতা, অগ্রপথিক, মহান স্বাধীনতা ও শোক দিবস সংখ্যা (ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৭), পৃ. ৮।

[২২] তদেব, পৃ. ১৬-১৯।

[২৩] অনুপম হায়াৎ, বঙ্গবন্ধু ও তার শিক্ষকগণ, https://www.prothomalo.com/opinion/article/1550371/%E0

"আমি কোরআন তেলাওয়াত করতাম রোজ। কোরআন শরীফের বাংলা তরজমাও কয়েক খণ্ড ছিল আমার কাছে। ঢাকা জেলে শামসুল হক সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরেজি তরজমাও পড়েছি।"[২৪] বঙ্গবন্ধুর এ বাণী থেকে বুঝা যায় যে,তিনি নিয়মিত আলকুরআন তেলাওয়াত করতেন, বাংলা অনুবাদ পড়তেন; সাথে সাথে ইংরেজী অনুবাদ পড়ে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হতেন। এভাবে তিনি ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জন করে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে সক্রিয় হন। নামাজ ইসলামের বাধ্যতামূলক উপাসনা বা ইবাদত। আর তাই তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, ''মাওলানা সাহেবের সাথে আমরা তিনজনই নামাজ পড়তাম। মাওলানা সাহেব মাগরিবের নামাজের পরে কোরআন মজিদের অর্থ করে আমাদের বোঝাতেন। রোজই এটা আমাদের জন্য বাঁধা নিয়ম ছিল।"[২৫] আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের উপর রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ করেছেন। আল-কুরআনের বাণী, "হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর রোজা ফরয করে দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের নবীগণের উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। এর ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা হবে"।[২৬] তিনি আল্লাহ তায়ালার ফরয ইবাদাত রোযা নিয়মিত পালন করতেন। তিনি বলেন, "একদিন আমি আওয়ামী লীগ অফিসে ইফতার করছিলাম। ঢাকায় রোজার সময় জেলের বাইরে থাকলে আমি আওয়ামী লীগ অফিসেই কর্মীদের নিয়ে ইফতার করে থাকতাম।"[২৭] এ প্রসঙ্গে অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস রমজান মাসে বঙ্গবন্ধুর রোজা রাখার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> রমজান মাসে আমি দেখেছি পূর্ব বাংলার শহর অঞ্চলের অধিক সম্পদশালী মুসলমানরা পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে তাদের সমশ্রেণিভূক্তদের চাইতে অধিকতর নিষ্ঠার সাথে উপবাস পালন করে থাকেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরের নির্বাচনী প্রচারের প্রচণ্ড পরিশ্রমের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান পবিত্র রমজান মাসে প্রত্যেক দিন উপবাস পালন করতেন। ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ তাঁর বাড়িতে আমি এই সময় গিয়েছিলাম এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটি জানি। রাওয়ালপিণ্ডি এবং করাচীতে অন্য কয়েকজন রাজনৈতিক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আমার কিন্তু ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এদের একজনের সাথে আমি মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলাম। অন্য জনের সাথে করেছিলাম মদ্যপান। এতদ্সত্ত্বেও মুজিব এবং তাঁর লোকেরা 'কাফির' বলে তিরস্কৃত হয়েছেন। পূর্ব বাংলার মুসলিম-ধর্মনিষ্ঠাকে এভাবে অকারণে কলঙ্কিত করে এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে সমস্যার সৃষ্টি আজ করা হয়েছে, তেমন সমস্যা পূর্ব বাংলায় আর কোনদিন হয়নি। পরিণতি হিসেবে নিশ্চিতভাবেই এই বেদনাদায়ক অপমানই অনুভূতিপ্রবণ বাঙ্গালিদের পৃথকীকরণের ব্যাপারে প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা যায়।[২৮]

এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় অনুশাসন পালনে কতটা আন্তরিক ছিলেন। হজ্ব ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। চট্টগ্রামে হজ্বের জন্য 'হিজবুল বাহার' নামক জায়গা বরাদ্দ দিয়েছেন। যেখানে বাংলাদেশের হজ্ব যাত্রীদের নিয়ে জাহাজ গমন করে। উক্ত জায়গাটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় বাংলাদেশের হজ্ব ব্যবস্থাপনার বাধার কারণ জানতে চেয়ে বলেছিলেন,

---

[২৪] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৮০; শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৮০।

[২৫] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৬৯।

[২৬] সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৩।

[২৭] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৭৫।

[২৮] অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস, বাংলাদেশ লাঞ্চিত, পৃ. ২২-২৩; মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ৮৫৪-৮৫৫।

'মুজিব: এক্সেলেন্সি একটা বিষয় একটু বুঝিয়ে বললে খুশি হতাম। প্রায় দুই বছর পর্যন্ত সৌদি আরব স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ায় সেখানকার পরহেজগার মুসলমানরা যে পবিত্র হজ্ব আদায় করতে পারছেন না, সে কথা ভেবে দেখেছেন কি এক্সেলেন্সি? এভাবে বাধার সৃষ্টি করা কি জায়েয আছে? পবিত্র কা'বা শরীফে তো দুনিয়ার সমস্ত দেশের মুসলমানদের নামায আদায়ের হক রয়েছে। তাহলে কেন এই বাধার সৃষ্টি? কেন আজ হাজার হাজার বাঙ্গালি পরহেজগার মুসলমানকে ভারতের পাসপোর্টে পবিত্র হজ্ব পালন করতে হচ্ছে?[২৯]

তিনি প্রথম হজ্ব যাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন এবং হজ্বের কর রহিত করেন। ফলে কম খরচে হজ্ব পালন সম্ভব হয়। তিনিই হজ্ব পালনের জন্য 'হিজবুল বাহার' জাহাজ ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশ থেকে প্রথম হজ্বযাত্রী প্রেরণ করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ২৮ ই জুলাই শাহাদাত লাভের কয়েকদিন আগে অধ্যক্ষ ওসমান সারওয়ার আলম চৌধুরীকে গণভবনে দেখে বলেছিলেন, 'সারওয়ার, এবার আমি হজ্বে যাব।' মন্ত্রী সোহরাব হোসেন বলেছিলেন, এবার আমাকে পাঠান, প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'নারে না, নেতাদের অনেক সময় রয়েছে। আমার সময় ফুরিয়ে আসছে, এবার আমি হজ্বে যাব।'[৩০] ইসলামের মৌলিক পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে ঈমানের পরই সালাত, সাওম ও হজ্বের স্থান। আর তিনি একজন মহান আল্লাহর আনুগত্যপ্রিয় বান্দা হয়ে এ আবশ্যকীয় ইবাদত পালণ করতেন ও পৃষ্টপোষকতা দিয়ে গেছেন।। এর মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রকৃতি ফুটে উঠে। খাঁটি ঈমানদার ও প্রকৃত একজন মুসলমান হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে সাবেক জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধু একজন ভালো মুসলমান, অনেক ক্ষেত্রে প্রায় গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মুসলিম লীগের একজন অনুগত সদস্য ও পাকিস্তান সৃষ্টির ধারণার সমর্থক ছিলেন এবং এই ধারণাকে বাস্তয়িত করতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।'[৩১] ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোয় আলোকিত ছিল বঙ্গবন্ধুর মন ও মনন। তিনি ছিলেন একজন দেশ প্রেমিক বাঙ্গালি, তেমনি ছিলেন একজন প্রকৃত ঈমানদার মুসলমান। তাঁর সারা জীবনের কর্মপ্রয়াস ছিল বাংলার জনগনের শোষণ ও মুক্তির অন্বেষণ। র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেন,

এই জন্যই ৭০ এর নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু টিভি রেডিওতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোন আইন তিনি করবেন না।' দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁর যেমন চিন্তা ছিল, তেমনি ছিল ইসলামের জন্য। ইসলামের যে বিষয়গুলো আল্লাহ হারাম করেছেন তিনি সেই বিষয়ে সজাগ ছিলেন। অথচ যারা নিজেদের ইসলামপন্থী বলে দাবি করেছেন তারাই হারাম জিনিস চালু করেছেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামের একটা প্রভাব ছিল। মানুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টির জন্য তিনি ইসলামকে ব্যবহার করেন নি।[৩২]

তিনি উদার ও অসম্প্রদায়িক চেতনার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি লেবাস সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার কারনেই তিনি ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার, ধর্মের নামে ব্যবসা করা এবং ধর্মের অজুহাতে অন্যের অধিকার হরণ করার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

---

[২৯] এম আক্তার মুকুল, মহাপুরুষ, (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ৬২।

[৩০] ড. নিতাই দাস সম্পাদিত, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, অধ্যক্ষ ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে, এবার আমি হজ্বে যাব (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮), পৃ. ১৩৫।

[৩১] অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ জাতির অবস্থা, পুর্মুদ্রণ, দৈনিক সংবাদ, ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

[৩২] র. আ. ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি, অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫, পৃ. ১৪৭-১৪৮।

অন্যায়ের প্রতিবাদ ও বাঙ্গালি মুসলমানদের বাঁচানোর তাগিদ অনুভব

বঙ্গবন্ধুর ভেতরে মুসলমানদের বাঁচানোর এক সুতীব্র অনুভূতি দানা বেঁধেছিল রাজনৈতিক জীবন শুরুর প্রারম্ভেই এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তখন তিনি ভেবেছিলেন বাঙ্গালি মুসলমানদের সফলতা। তার আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, "তখন রাজনীতি শুরু করেছি ভীষণভাবে। সভা করি, বক্তৃতা করি। খেলার দিকে আর নজর নাই। শুধু মুসলিম লীগ, আর ছাত্রলীগ। পাকিস্তান আনতেই হবে, নতুবা মুসলমানদের বাঁচার উপায় নাই। খবরের কাগজ 'আজাদ', যা লেখে তাই সত্য বলে মনে হয়।"[৩৩] তিনি আরো বলেন, "১৯৪২ সালে আমি ফরিদপুর যেয়ে ছাত্রদের দলাদলি শেষ করে ফেলতে সক্ষম হলাম এবং পাকিস্তানের জন্যই যে আমাদের সংগ্রাম করা দরকার এ কথা তারা স্বীকার করলেন। তখন মোহন মিয়া সাহেব ও সালাম খান সাহেব জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।"[৩৪] স্কুল জীবনেও বন্ধুর অন্যায়ভাবে নির্যাতনের শিকার হওয়ায় তিনি শৈশবে তার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় তিনি বলেন,

> বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৪১ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নেন, তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ওই সময় একজন মুসলমান ছাত্র অন্যায়ভাবে মারপিটের শিকার হয়। বঙ্গবন্ধু তখন স্কুলের শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কাছে বিষয়টির মীমাংসা চান। শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অন্যান্যের সহায়তা নিয়ে বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে মিটমাট করেন। বঙ্গবন্ধু ওই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। ওই স্কুলে আর কখনো এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ইসলামে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ঈমানের দাবী। হাদীসে শক্তি থাকলে হাতে, না হয় মৌখিক প্রতিবাদ, অন্যথায় অন্তর দিয়ে ঘৃনা করতে বলা হয়েছে।[৩৫] ইসলামের এ মৌলিক শিক্ষা তিনি তাঁর জীবনে বর্মের মত গ্রহণ করেছিলেন। হয়ত শৈশবের ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি থেকেই তাঁর এ মানসিক শক্তি ও মনোবল তৈরী হয়েছিল।

উদার ধর্মীয় মনোভাব

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ধর্মে ভিন্ন মতাবলম্বীদের হত্যা করার কোন নিয়ম নেই। খাজা নাজিমুদ্দীনের আমলে আহমদিয়া বা কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন থেকে পাঞ্জাবে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হাজার হাজার লোক মারা যায়। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গী ও উদারভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার দক্ষতা প্রমাণ করে ইসলামের গভীর জ্ঞান তাঁর ছিল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি অনেক উদার ছিলেন। তিনি বলেন,

> কাদিয়ানিরা মুসলমান না– এটাই হল এই সকল আলেমদের প্রচার। আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নাই। তবে একমত না হওয়ার জন্য যে অন্যকে হত্যা করা হবে, এটা যে ইসলাম পছন্দ করে না এবং একে অন্যায় মনে করা হয়- এটুকু ধারণা আমার আছে। ... এমনকি বিধর্মীর উপরও অন্যায়ভাবে অত্যাচার করা ইসলামে কড়াভাবে নিষেধ করা আছে।[৩৬]

তাঁর চেতনায় ইসলামের সঠিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কারণ ইসলামে অন্যায়ভাবে হত্যাকে অবৈধ

---

[৩৩] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৫।

[৩৪] তদেব, পৃ. ১৬।

[৩৫] "হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ কাউকে অন্যায় করতে দেখলে শক্তি ও ক্ষমতা থাকলে হাত দ্বারা বাধা দিবে। যদি তা না থাকে তাহলে মুখ দিয়ে বাধা দিবে, যদি তাও না থাকে তবে উক্ত কাজকে মনে মনে ঘৃনা করবে। আর তা হল সর্ব নিম্নস্তরের ঈমান।" বুখারী।

[৩৬] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৪০-২৪১।

ঘোষণা করা হয়েছে।

মৌলিক মানবীয় গুনাবলী

বঙ্গবন্ধু মানবিক গুনাবলী সমৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিক্ষকদের সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। 'স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার সময়ও অধ্যাপক সাইদুর রহমানের পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে দেখেছি।'[৩৭] তিনি আলেম-উলামাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে খুব সম্মান করতেন। তিনি পূর্ব বাংলার বিখ্যাত আলেম, যিনি 'সদর সাহেব হুজুর' নামে পরিচিত, আল্লামা সামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) সম্পর্কে লিখেন, "গোপালগঞ্জে আমার নিজের ইউনিয়নে পূর্ব বাংলার এক বিখ্যাত আলেম মওলানা শামসুল হক সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন।"[৩৮] ১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ওই সময় দুর্ভিক্ষের অবস্থা, বেকার হোস্টেলের ছাত্রদের সহায়তা এবং কলেজের শিক্ষক সাইদুর রহমান, আই এইচ জুবেরী, নারায়ণ বাবুসহ অধ্যাপকদের সহমর্মিতা সম্পর্কে জানা যায় বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে। তিনি লিখেছেন,

> 'এই সময় শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমিও লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অনেকগুলি লঙ্গরখানা খুললাম। দিনে একবার করে খাবার দিতাম। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসা এবং আরও অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললাম। দিনভর কাজ করতাম, আর রাতে কোনো দিন বেকার হোস্টেলে ফিরে আসতাম, কোনো দিন লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতাম।[৩৯]'

নিরন্নকে অন্নদান, অসহায়কে সাহায্য প্রদান- এসব মানবীয় গুনাবলি ইসলামের অনবদ্য শিক্ষা; যা বঙ্গবন্ধুর ব্যাক্তি জীবনে আমরা দেখতে পাই।

জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা

হাদীসে এসেছে, 'দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ'। তিনি জন্মভূমির মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এদেশকে, এদেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। আর দেশকে ভালোবাসা ইসলামের একটি ইবাদাত। এটিকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, "মুসলিম লীগ ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলেও জনগণের প্রয়োজন ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। ... স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে যেতে হবে।"[৪০] মূলতঃ তিনি এ দেশের প্রতি ভালবাসার কারণেই ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের চেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতি বেশী নজর দিয়েছেন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্য চরম আকার ধারণ করেছিল পূর্ব পাকিস্তানে।[৪১]

---

[৩৭] সৈয়দ আবুল মকসুদ জানিয়েছেন। অনুপম হায়াৎ, বঙ্গবন্ধু ও তার শিক্ষকগণ, https://www.prothomalo.com/opinion/article/1550371/%E0

[৩৮] শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৫৬।

[৩৯] তদেব, পৃ. ১৮।

[৪০] মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, পৃ. ৭৮-৭৯; নিগার চৌধুরী, বাঙালি জাতীয়তাবাদ উদ্ভব ও বিকাশ (ঢাকা : প্রথম প্রকাশ, ২০১৫) পৃ. ২৬০-২৬১।

[৪১] ১৯৪৭-৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। শুরুতে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫২% ই ছিল পূর্ব বাংলার অবদান। কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আঞ্চলিক আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯-৫০ সালের উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা ছিল ১৯%। ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২% এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৫% এ। ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বৈষম্য ছিল ৪৬%। ১৯৪৭-৬৬ সালের মধ্যে যে বৈদেশিক সাহায্য দেশের উন্নয়নে ব্যয় হয় তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ৩৪%। ব্যাংক, বীমা, শিল্প কলকারখানার মালিকানা এককভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে চলে যায়। মুনতাসীর মামুন ও মোঃ মাহববুর রহমান, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস (ঢাকা, সুবর্ণ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ২০১৩) পৃ. ১৬৭।

শুধুমাত্র স্বার্থ হাসিলকারীরাই ধর্মকে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য হাতিয়ার হসিবে ব্যবহার করে থাকে। জন্মভূমির প্রতি সীমাহীন ভালবাসার শক্তিই তাঁকে নৈতিক বলে বলিয়ান করে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক করে তুলেছে।

মুসলিম হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন

বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শেষে বিমান বন্দর থেকে লাখো মানুষের গগনবিদারী জয় বাংলা শ্লোগানের মধ্যদিয়ে একটি খোলা ট্রাকে রেসকোর্স ময়দানে এসে হাজির হলেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে তিনি এখানে তার বক্তব্যে ইন্দোনেশিয়ার পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে অখ্যায়িত করলেন। একই বক্তৃতায় তিনি আবার রাষ্ট্রীয় চার স্তম্ভের মধ্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষতার কথাও বললেন।[৪২] ধর্ম নিরপেক্ষতাকে তিনি ধর্মহীনতা হিসেবে দেখেননি।[৪৩] আসলে তিনি প্রগতিশীল চেতনার পাশাপাশি ইসলামী চেতনাও মনোজগতে ধারণ করার এটা একটি প্রমাণ বহন করে। আবার ১৯৭২ সালে সৌদি আরবে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে ছয় সহস্রাধিক বাংলাদেশি মুসলমানকে হজ্ব পালনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস বিপন্ন, পাকিস্তানিদের এমন প্রচারণার জবাবে মুসলিম বিশ্বের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, "কেবল ইন্দোনেশিয়ার পরেই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র।" তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি আরো বলেন, ''ইসলামের নামে এ দেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মুসলমানদের মেরেছে, অসম্মান করেছে নারীদের। আমি ইসলামকে অসম্মান করতে দিতে চাই না।'' তিনি তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে চালানো গণহত্যার পরিসর নির্ধারণের আহ্বানও জানান জাতিসংঘকে। তাঁর বক্তব্যে মুসলমান হত্যাকে ইসলামের প্রতি অসম্মান হিসেবে বিবেচনা করাকে ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ।

ইসলাম ও ধর্ম নিরেপেক্ষতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু বেতারে ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি একটি চমৎকার বিষয়ের অবতারণা করেন। নামসর্বস্ব বা অনুষ্ঠান সর্বস্ব মুসলিম না হয়ে সত্যিকারের মুসলিম এবং ইসলামের পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন,

> "আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই, এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য আমরা লেবাসসর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসূলে করীম (সা.) এর ইসলাম। যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র।"[৪৪]

১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের আলোচনার জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সে অধিবেশনে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা নয় বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার স্ব-স্ব

[৪২] মেজর নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পাচাত্তর, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী-২০১৮),পৃ. ৩১।

[৪৩] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম পৃ. ১৭১।

[৪৪] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম পৃ. ১৭০।

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চাই না এবং তা করবোও না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারো নেই।"[৪৫] এ অনবদ্য ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় চেনতার প্রকাশঘটে।

ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অবদান

ইসলাম প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে তাবলীগে দ্বীনের জন্য উপমহাদেশে 'তাবলীগ জামায়াত' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯২৫ সালে।[৪৬] আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাণী প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "হে রাসূল! যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। যদি তা না করেন তাহলে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না।"[৪৭] তখন রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি কমিউনিস্ট দেশ ছিল। সেখানে তাবলীগ জামাত প্রবেশের অনুমতি ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধে রাশিয়া বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে, ফলে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সুযোগে তিনি রাশিয়ায় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণ করেন। যা আজও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে অব্যাহত আছে।[৪৮] ইসলামের প্রচার-প্রসারে বঙ্গবন্ধুর ইহা অনেক বড় অবদান। আবার প্রতি বছর ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে তাবলীগ জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলন 'বিশ্ব ইজতেমা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজার হাজার লোক একত্রিত হয়। ইসলামি দাওয়াতের কাজ যাতে সুন্দরভাবে প্ররিচালিত হতে পারে সেজন্য বঙ্গবন্ধু টঙ্গীতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন।[৪৯] দ্বীনি দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য তাবলীগ জামায়াতের ঢাকার কাকরাইলের কেন্দ্রীয় মসজিদটি খুবই অপ্রশস্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু এ মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য নির্দেশ দিয়ে জমি বরাদ্দ করেন।[৫০] পাকিস্তান আমলে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত ছিল না। ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও ইসলামি আকীদাভিত্তিক জীবন গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এর পুনর্গঠন করেন। নতুন নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড'।[৫১] বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাক্কানী[৫২] আলেম উলামাদের সংগঠিত করে মহানবী (সা.) এর জীবন ও কর্ম জনগণের মাঝে তুলে ধরার জন্যে বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ সীরাত মজলিশ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে মাহে রবিউল আউয়ালে বায়তুল মোকাররম মসজিদ চত্তরে রাসূল (সা.) এর

---

[৪৬] মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ও তাঁর দ্বীনি দাওয়াত, বঙ্গানুবাদ মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (ঢাকা: মুহাম্মদী বুক হাউজ), পৃ. ৮৫।

[৪৭] সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৭

[৪৮] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৫।

[৪৯] তদেব, পৃ. ১৭৫।

[৫০] মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মচিন্তা,অগ্রপথিক, জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা, (ঢাকা: ইফাবা-১৯৯৮), পৃ. ১২৮।

[৫১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

[৫২] 'হক্বানী' আরবী শব্দ। বাংলা অর্থ সত্যপন্থী। ইসলাম ধর্মে অল্পশিক্ষিত কিছুলোক যাদের কোন ধর্মীয় পড়াশুনা নাই বরং লম্বা জামা পরে ধর্মচর্চা করে আবার কোথাও নেতৃত্বও দেয়। সাধারণ মানুষ এদের 'আলেম' বলে। এদের কিছু কিছু ধর্ম ব্যবসায়ীও। 'হক্বানী' বলতে এ শ্রেণিকে বুঝানো হয়নি। বরং যারা সত্যিকারভাবে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ তাদের 'হক্বানী আলেম' বলা হয়।

[৫৩] শামীম মোহাম্মদ আফজাল, শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৬।

[৫৪] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৩।

[৫৫] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম পৃ. ১৭৪।

জীবনীর উপর বৃহত্তর আঙ্গিকে জাতীয়ভাবে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।[৫৩] সরকার প্রধান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মাহফিলের উদ্বোধন করেন।[৫৪] বেতার ও টিভিতে কোরআন তেলাওয়াত ও তাফসীর প্রচারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম বেতার ও টিভিতে সকালের সূচনা এবং দিবসের কর্মসূচি তিলাওয়াতের মাধ্যমে সমাপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন।[৫৫] বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বক্তৃতা শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন। এ মুনাজাত স্বাধীনতা ও তার নিরাপদে দেশে ফেরার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মুনাজাত। সৃষ্টিকর্তার কাছে তিনি ধন্যবাদ জানানোর জন্য এ মুনাজাত করেছিলেন। এতে তার ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটে। পাকিস্তান আমলে ইসলামি দিবসসমূহে সরকারি ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটির ব্যবস্থা করেন। যথাযোগ্য মর্যাদায় ধর্মীয় দিবসসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে সিনেমা হলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।[৫৬] বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) এর অধিবেশনে যোগ দিয়ে ইসলাম ও বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামনে যে বক্তব্য প্রদান করেন, তাতে আরব বিশ্বসহ মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।[৫৭] ইসলামে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ হলেও পাকিস্তান আমলে রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার নামে জুয়া, হাউজি ও বাজি ধরার প্রতিযোগিতা চলতো। বঙ্গবন্ধু এটি বন্ধ করে সেখানে গাছ লাগানের ব্যবস্থা করেন। কারণ মহানবী (সা.) বলেন, "আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, যদি কোনো মুসলিম কোনো গাছ রোপন করে অথবা ক্ষেতে ফসল বোনে আর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুস্পদ প্রাণী খায়, তবে তা তার জন্য সাদকা হিসেব গণ্য হবে।"[৫৮] তিনি বৃক্ষরোপন করে এ মাঠের নামকরণ করেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।[৫৯] ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন করেন এবং সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেন। তিনি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিকেল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করেন।[৬০] এ সমস্ত মৌলিক কার্যাবলীর মাধ্যম তাঁর ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রকাশ পায়। ধর্মের প্রতি কতটা গভীর অনুরাগ থাকলে সাংবিধানিক কাঠামোর বাহিরে এসে তিনি ধর্মীয় চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

আল্লাহ তায়ালা মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপকে হারাম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, "হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও কিসমত তালাশ করার তীর নাপাক শয়তানী কাজ। এসব থেকে দূরে থাক, যাকে তোমরা সফল হতে পার। অবশ্যই শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে দুশমনী ও হিংসার জন্ম দিতে চায় এবং

---

[৫৬] তদেব, পৃ. ১৭৪।

[৫৭] ড. মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর সময়কাল (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০) পৃ. ৫৫।

[৫৮] ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, অধ্যায় : আল-মুযারাআহ, অনুচ্ছেদ : ফাদলিয যারঈ ওয়াল গারছি ইযা উকিলা মিনহু (রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ১৮১, হাদীস নং-২৩২০।

[৫৯] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম পৃ. ১৭৪-১৭৫।

[৬০] তদেব, পৃ. ১৭৬।

[৬১] সূরা আল-মায়িদাহ: ৯০-৯১

[৬২] সূরা বনী ইসরাঈল: ৩২

তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর ও নামাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?"[৬১] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "যিনার ধারে কাছেও তোমরা যেও না। নিশ্চয়ই তা বেহায়াপনা ও বড়ই মন্দ পথ।"[৬২] সুতরাং বলা যায় বঙ্গবন্ধুর ধ্যাণ ধারনায় ধর্মীয় চেতনা জাগরুক ছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে অবাধে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলতো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান করেন।[৬৩] ইসলামী এ সকল অনুশাসন বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

ইসলাম প্রচারের উন্নয়নে অবদান

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের উপর চলার জন্য জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। ইসলামের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী সঠিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে নিষিদ্ধ হওয়া ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু করেন। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ নামকরণ করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন।[৬৪] কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে[৬৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৬] ইসলামী আদর্শের যথাযথ প্রকাশ তথা ইসলামের উদার মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।"[৬৭] ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে মুহাম্মদ (সা.) সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতেন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। ভিন্ন ধর্মের কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি তাদের দেখতে যেতেন এবং তার মাথার কাছে যেয়ে বসতেন।[৬৮] সায়্যিদ আমীর আলী

---

[৬৩] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৪।

[৬৪] স্মরণিকা মোক দিবস সংখ্যা,১৫ আগস্ট, ১৯৯৩। ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত।

[৬৫] শামীম মোহাম্মদ আফজাল, শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৬।

[৬৬] ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্টপতি উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি সরকারিভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত"বাংলা পিডিয়া" ১ম খন্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে "১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমিকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশবলে ' ইসলামিক ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

[৬৭] সূরা মুমতাহিনা: ৮

[৬৮] ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-জানায়িয (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, তা.বি.) খণ্ড ৩, হাদীস নং-৩০৯৭।

[৬৯] Syed Amir Ali, The Spirit of Islam (Delhi : Low price publication, 1990) p. 212.

তোমাদেরকে আল্লাহর যিকর ও নামাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে?”[৬১] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, “যিনার ধারে কাছেও তোমরা যেও না। নিশ্চয়ই তা বেহায়াপনা ও বড়ই মন্দ পথ।”[৬২] সুতরাং বলা যায় বঙ্গবন্ধুর ধ্যাণ ধারনায় ধর্মীয় চেতনা জাগরুক ছিল। ইসলামের নামে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে অবাধে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলতো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান করেন।[৬৩] ইসলামী এ সকল অনুশাসন বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

ইসলাম প্রচারের উন্নয়নে অবদান

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের উপর চলার জন্য জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন। ইসলামের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী সঠিকভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে নিষিদ্ধ হওয়া ইসলামিক একাডেমি পুনরায় চালু করেন। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ নামকরণ করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন।[৬৪] কুরআন ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে[৬৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান এক অধ্যাদেশ জারি করে এই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৬] ইসলামী আদর্শের যথাযথ প্রকাশ তথা ইসলামের উদার মানবতাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা ছিল বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।”[৬৭] ভিন্ন ধর্মের মানুষদের সাথে মুহাম্মদ (সা.) সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতেন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। ভিন্ন ধর্মের কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি তাদের দেখতে যেতেন এবং তার মাথার কাছে যেয়ে বসতেন।[৬৮] সায়্যিদ আমীর আলী

---

[৬৩] রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭৪।

[৬৪] স্মরণিকা মোক দিবস সংখ্যা,১৫ আগস্ট, ১৯৯৩। ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত।

[৬৫] শামীম মোহাম্মদ আফজাল, শেখ হাসিনার প্রেরণায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ. ২৬।

[৬৬] ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্পর্কে দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্টপতি উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী অধ্যাদেশটি সরকারিভাবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয় ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত“বাংলা পিডিয়া” ১ম খন্ডের ৪৪১ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে উল্লেখ হয়েছে “১৯৭৫ সনের ২২ মার্চ বায়তুল মোকাররাম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমিকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশবলে ‘ ইসলামিক ফাউন্ডেশন” প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট প্রণীত হয়।

[৬৭] সূরা মুমতাহিনা: ৮

[৬৮] ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : আল-জানায়িয (বৈরুত : দারুল কুতুবিল আরাবী, তা.বি.) খণ্ড ৩, হাদীস নং-৩০৯৭।

[৬৯] Syed Amir Ali, The Spirit of Islam (Delhi : Low price publication, 1990) p. 212.

বলেন, "যখন বিশ্বের অর্ধেক জুড়ে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, মুসলিম শাসক ও গভর্নরগণ মুসলিম সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম অনুযায়ী উপাসনা করার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছিলেন।"[৬৯] খলিফা উমর (রা.) সফল ধর্মের মানুষকে সহানুভূতির চোখে দেখতেন। সংখ্যালঘুরা জিযিয়া কর দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করতেন। খলিফা যদি তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হতেন তবে তাদের কর ফেরত দিতেন। যুদ্ধের শুরুতে উপাসনালয়, গির্জা, শিশু, বৃদ্ধা ইত্যাদির উপর আক্রমণ করতে নিষেধ করতেন।[৭০] স্বাধীনতাত্তোরকালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করেন। তখন এদেশের জনগণের শতকরা ৮৬.৬০ ভাগ মুসলমান, ১২.১ ভাগ হিন্দু, ০.৬ ভাগ বৌদ্ধ এবং ০.৩ ভাগ খ্রিস্টান ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায় বসবাস করতো।[৭১] বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব শ্রেণির নাগরিকের জন্য সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।[৭২] কারণ একটা রাষ্ট্রে বহু ধর্মের লোক থাকবে কিন্ত রাষ্ট্রতো সকলের। রাষ্ট্রদর্শনের এ সহজপাঠ তিনি ধর্মের মৌলিক শিক্ষার মত অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যেমন রাসূল (সা.) মদীনা সনদে দেখিয়েছিলেন।[৭৩]

ভাষণসমূহে ইসলামি ভাবধারা

বঙ্গবন্ধুর অসংখ্য স্মরণীয় ভাষণ রয়েছে। এ ভাষণসমূহের মধ্যে আমরা ইসলামি ভাবধারা পরিলক্ষিত হতে দেখি। কয়েকটি ভাষণের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো:

ক. ১৯৭০ সালের নভেম্বরে বেতার ভাষণে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান, মুসলমান ধর্ম পালন করবে। হিন্দু, হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান, খ্রিস্টানের ধর্ম পালন করবে। কেউ কাউকে বাধা দিবার উচিত না, দিতে পারবে না।"[৭৪]

খ. ৭ মার্চ ১৯৭১: "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ।"[৭৫] কোন কাজের সংকল্প করে 'ইনশাআল্লাহ'[৭৬] বলতে হয়, এটা ইসলামী সংস্কৃতি। রাসূল (সা.) 'ইনশাআল্লাহ' না বলায় তাঁর কাছে কিছুদিন 'অহী' আসা বন্ধ ছিল। বঙ্গবন্ধুর আল্লাহ তায়ালার প্রতি সীমাহীন আস্থা ছিল। আর তাই তিনি তাঁর বহু সংখ্যক ভাষণের প্রথমে, মাঝে ও শেষে 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি বলেছেন। এ থেকে এ কথা অনুধাবন করা যায় যে, তিনি সবসময় আল্লাহর

---

[৭০] অধ্যাপক কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা : আলী পাবলিকেশনস, ১৯৮৬) পৃ. ১৭৭।

[৭১] মোঃ শামসুল কবীর খান, বাংলাদেশের অর্থনীতি (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ২০০৪) পৃ. ৫০।

[৭২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সংশোধিত, অনুচ্ছেদ-২৭) পৃ. ৮।

[৭৩] মদীনার সনদে রাসূল (সা.) বিভিন্ন গোত্রকে সাথে নিয়ে মদীনার সংবিধান তৈরী করেছিলেন। যেমন: আউস গোত্র, খাযরাজ গোত্র, বনি মোস্তালিক ও বনিয়ামিন প্রমুখ গোত্র।

[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮৫।

[৭৫] ড. হারুন-অর-রশিদ, ছেষট্টি থেকে একাত্তর, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, এপ্রিল ২০০৯) পৃ. ৪৫।

[৭৬] 'ইনশাআল্লাহ' অর্থ যদি আল্লাহ তায়ালা চান। এখানে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস জড়িত। আর তাহল কোন মানুষ নিশ্চিত করে বলতে পারেনা আগামী দিন সে বাঁচবে। আল্লাহ তায়ালা যে কোন সময় তার মৃত্যু দিতে পারেন। জীবন -মৃত্যুর মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং ভবিষ্যতে কোন কিছু করার ইচ্ছা বা ঘোষনা দিলে বলতে হয় 'ইনশাআল্লাহ' মানে যদি আল্লাহ চাহেন।

উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর ঈমানী শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি একজন খাঁটি মুমিন ও মুসলিম ছিলেন। যা তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য ও ভাষনে 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ যোগ করার মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়। তাঁর ভাষণের এ সকল উক্তি দ্বারা তাঁর দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, মানবতাবোধ, ঈমানী চেতনা ও আল্লাহর উপর অগাধ ভরসার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এবং বুঝা যায় তার ঈমানী শক্তি কত মজবুত ছিল।

উপসংহার

ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় অনুশাসন বঙ্গবন্ধু মেনে চলতেন। স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে মাত্র সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে তিনি ইসলামের বিপুল খেদমত করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা থাকার পরেও মুজিব ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামী অনুশাসনের প্রতি অগ্রসর হন। ইসলামী গোত্রগুলোর জোর দাবীর প্রেক্ষিতে এ্যালকোহল তৈরী ও বিপনন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। 'বাংলাদেশ অরগানাইজেশন অব দি ইসলামিক কনফারেন্স' এবং 'ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের' সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে যান; যা মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রসমুহের সাথে কিছু মাত্রায় সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করে। শেষ বছরগুলোতে তিনি তার স্বভাব সুলভ জয় বাংলা অভিবাদনের বদলে ধার্মিক মুসলমানদের পছন্দনীয় 'খোদা হাফেজ' বলতেন।[৭৭] বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ধর্মীয় চেতনায় লালিত পালিত হয়েই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা, অসহায়দের সাহায্য করা ও অধিকার বঞ্চিত বাঙ্গালির জন্য সমূহ ত্যাগ স্বীকার করার দীক্ষা নিয়েছেন। প্রথমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এবং পরে সেই পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের সময়কালেও তিনি ইসলামী চেতনা ধারণ করতেন। জনসাধরণের সামনে উপস্থিতি ও ভাষণের সময় তিনি ইসলামিক সম্ভাষণ ও শ্লোগান বাড়িয়ে দেন এবং ইসলামিক আদর্শের উল্লেখ করতে থাকেন। এ সবকিছু বঙ্গবন্ধুর জীবনে ইসলামী চেতনাবোধের প্রমাণ বহন করে। যা তাঁর জীবনে ইসলামী মূল্যবোধেরই বহিঃপ্রকাশ।

[৭৭] www.somewhereinblog.net/blog/banglarkantho/29657478, accessed 27/12/18.